ভোরের কাগজ

174

তারিখ ... JUL 13 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

কাল আজ কাল

আবদুল বায়েস

চাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিদ্যা

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি নিয়ে বিশ্ব পদার্পণ করছে একবিংশ শতাব্দীতে? শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবী কতোটুকু এগিয়েছে গেলো শতাব্দীতে? কিংবা একটু ঘুরিয়ে করলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এ রকম : একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, পৃথিবী কি সে প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত? আমার টেবিলে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত একটা বই : "The State of the World's Children 1999—Education", এবং এই বইতে বিধৃত আছে বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তথ্যবহুল পর্যালোচনা। যদিও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি রচিত, তবুও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু পরিসংখ্যান আমাদের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়। তাই ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য ওই প্রতিবেদন থেকে বেছে বেছে বক্তব্য পেশ করার প্রয়াস নেওয়া হলো।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এমন প্রায় এক বিলিয়ন একবিংশ শতাব্দীতে পা দেবে যারা কোনো লেখাপড়া জানে না (এমনকি নিজের নামটিও লিখতে পারে না)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই এক বিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য ও সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হতে থাকবে আগামী শতাব্দীতে, যেমনটি তারা ছিল আগের শতাব্দীতে। তারা হচ্ছে বিশ্বের কার্যত নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং দিন দিন এদের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশ্বকে এই বোঝা নিয়ে পা দিতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে। নিরক্ষরতার পরিণাম ভয়াবহ, এমনকি জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। যদিও ৫০ বছর পূর্বে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় এবং ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সম্মেলনে শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, পরিসংখ্যান প্রতীয়মান করে যে বিশ্বব্যাপী সে অধিকার অস্বীকৃত থেকে যাচ্ছে।

ওই যে বললাম প্রায় এক বিলিয়ন নিরক্ষর লোক প্রবেশ করতে যাচ্ছে নতুন শতাব্দীতে, তবা কিন্তু বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর ছয় ভাগের এক ভাগ। একই সঙ্গে অনুন্নত বিশ্বের মোট ৬২৫ মিলিয়ন প্রাথমিক স্কুলবয়সী শিশুর মধ্যে ১৩০ মিলিয়ন শিশুর মৌলিক শিক্ষায় প্রবেশক্ষমতা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ, স্কুল বয়সীদের ২১ শতাংশ থাকছে স্কুলের বাইরে, ৭৯ শতাংশ ভিতরে। যারা স্কুলে যেতে পারছে তারা আবার খুব নিম্নমানের পড়াশুনা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আগে বাড়ছে। অন্যদিকে, ১৩০ মিলিয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুর মধ্যে ৭৩ মিলিয়ন হচ্ছে মেয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গড়পড়তা প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তির হার প্রান্তিকভাবে বেড়েছে, তবে ৫০ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করেছে এই অঞ্চলে মহিলাদের দুই-তৃতীয়াংশ ও পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ নিরক্ষর। ছেলে ও মেয়ে অন্তর্ভুক্তি হারের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর বিশেষত, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে, যেখানে তালেবান কর্তৃপক্ষ মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ করে রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে বলে মনে হয়। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার গড়পড়তা ৭৫ শতাংশ এবং এখানে লিঙ্গ ব্যবধান নেই বললেই চলে (পুরুষ ৭৫ শতাংশ, মহিলা ৭৬ শতাংশ)। এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছেলে ও মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার নিম্নরূপ (শতাংশ) : পাকিস্তান (৭১ বনাম ৬২), ভারত (৭৫ বনাম ৬১), চীন (৯৫ বনাম ৯৪), নেপাল (৮০ বনাম ৬০)। দক্ষিণ এশিয়ার মূল সমস্যা হচ্ছে চরম দারিদ্র্যজনিত অবস্থা, যেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দৈনিক মাথাপিছু আয় এক ডলার বা ৫০ টাকার চাইতে কম। দারিদ্র্যের কশাঘাতে [illegible] পরিবারগুলোতে শিশুশ্রমের আধিক্য [illegible] পরিণতিতে দেখা যায় প্রাথমিক [illegible] অন্তর্ভুক্তির হার বেশি হলেও আবার ড্রপ [illegible] ঝরে পড়ার হারও বেশি।

নৈতিকতা, বিচারবোধ ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার যৌক্তিকতা বেরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার হার ও শিশু মৃত্যুর হারের মধ্যকার বিপরীতমুখী সম্পর্কটি প্রণিধানযোগ্য। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার যদি ১০ শতাংশ-পয়েন্ট বৃদ্ধি করা যায় তাহলে শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে হ্রাস পেতে পারে ৪.১। দ্বিতীয়ত [illegible] শতাংশ-পয়েন্ট অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেলে ৪ জন শিশুর জীবন রক্ষা পায়। আর যদি একই মাত্রায় মহিলাদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হার বৃদ্ধি করা যায় তাহলে প্রতি হাজারে প্রায় ৬ জন শিশুর জীবন রক্ষা পায়। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এটা বোঝায় যে পাকিস্তানের মতো একটা দেশে যদি ১০০০ মেয়ের স্কুলে যাওয়া একবছরে বৃদ্ধি করা যায় তাহলে ৬০ জন শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে না। পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে দেওয়া উদাহরণটি বাংলাদেশ তথা অন্য উন্নয়নশীল দেশের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইদানীংকালে সূচিত কর্মসূচিগুলো তাই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে, এ উদ্যোগটা আরো অনেক আগে নেওয়া যেগরে আমরা বোধ হয় কিছুটা বুক উঁচিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারতাম। দুর্ভাগ্য আমাদের। তবুও বলতে হয়, বেটার লেট দ্যান নেভার।

> আগামী দিনগুলোতে মানবপুঁজির অভাব যে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তা বোধ হয় একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এবং সেটা ঘটতে যাচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত খুলে যাচ্ছে এবং যখন তারাই পুরস্কৃত হবে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে আগ্রহী এবং যাদের সামর্থ্য আছে।

মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে শুধুমাত্র শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে তা নয়। কথায় বলে, মায়ের বিদ্যা পরিবারের বিদ্যা, আর বাপের বিদ্যা শুধু বাপের বিদ্যা। মেয়েদেরকে যদি অতিরিক্ত একবছর বিদ্যালয়ে রাখা যায় তাহলে সন্তান প্রজনন হার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন কম থাকে শিশু জন্মের সময় মায়ের মৃত্যুর সম্ভাবনা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ব্রাজিলে [illegible] মহিলাদের শিশুর সংখ্যা গড়পড়তা ৬.৫, [illegible] মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছে এমন মহিলাদের শিশুর সংখ্যা ২.৫। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের কেরালা রাজ্যে সর্বজনীন সাক্ষরতা বিদ্যমান থাকার ফলে সেখানকার শিশুমৃত্যুর হার সমগ্র অনুন্নত বিশ্বের সর্বনিম্ন এবং প্রজনন হার সবচেয়ে কম।

শিশুরা কেন বিদ্যালয়ে যায় না? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করা যায়, তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুএকটা তুলে ধরা হলো। এক. অনেক সমাজে নারীশিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ তাদেরকে বিদ্যালয় থেকে বঞ্চিত রাখছে। দুই. কোটি কোটি শিশু (ছেলে ও মেয়ে) পারিবারিক প্রয়োজনে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তিন. অনেকের জন্য বিদ্যালয়ের অবস্থান অনেক দূরে সুতরাং এতো পথ অতিক্রম করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা নেওয়ার আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া, স্কুল গৃহের সুযোগ সুবিধার অভাব অনেক শিশুকে কাছে টানতে ব্যর্থ হয়। বিশেষত মেয়ে শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয় শুধুমাত্র ছেলে সহপাঠীর কাছ থেকে নয়, সার্বিকভাবেও

বিদ্যালয়ের পরিবেশ মেয়েদেরকে অবজ্ঞা করে চলে। চার. অনেক দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি ৫ জন ছাত্রের মধ্যে ছাত্র ২ জন বেঞ্চিতে বসবার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে একজন শিক্ষককে পাঠদান করতে হয় ৬৭ জন ছাত্রছাত্রীকে। সুতরাং, শিশুরা ক্লাসের শুরুতেই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে লিপ্ত হয় শুধুমাত্র বেঞ্চে বসার জন্য, একজন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শিক্ষকের কথা শুনবার জন্য এবং জীর্ণ বইয়ের পাতায় চোখ ফেলবার জন্য। দেশের বিভিন্ন স্কুলের অবস্থা যে আরো কতো খারাপ তা না বলাই ভালো। সব মিলিয়ে ভাঙা স্কুল, জীর্ণ বই আর শীর্ণকায় শিক্ষক শিশুদের আকৃষ্ট করতে পারে না — তাদের মনোযোগ কাড়তে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া, পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা তাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারঙ্গম করে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না সেখানে শিক্ষকরা মিলিটারী কায়দায় ক্লাস শাসন করে। বেতের ঘা, কানে ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করানো, এক অধ্যায় পড়িয়ে পাঁচ অধ্যায়ের পড়া আদায়, ইত্যাদি কৌশল কোমলমতি শিশুকে তার পছন্দের বাইরে বিদ্যালয় আসতে বাধ্য করে।

যে বিষয়টি আমরা প্রায়
হই তা হলো এই যে এ
হওয়ার সুযোগ সুবি
বিদ্যালয়গুলোতে প্রাপ্ত শিক্ষ
চাহিদাকে উৎসাহ জোগ
গবেষণারত অনেক গবে
জানতে পেরেছেন যে শি
চাইতে বরং তাদের কাজে
পছন্দ করে, কারণ বিদ
কোনো কাজে আসবে ব
যেমন, সেনেগালের ভি
পালিশকারী ১০ বছর বয়স
অনেকটা এ রকম : 'আমা
নেই। আমি সেখানে কি
তাদেরকে আমি চিনি। যে
তারা বসে আছে অথবা য
তাদের পিছনে বাবা-মা অ
তারা কোনো প্রতিদান দিতে
না জানে কৃষিকাজ, না বা
লেখাপড়া করতে চাই, ত
স্কুলে যেতে বাধ্য করে ত
স্কুল থেকে পালিয়ে আসবে
বিশ্বের ২৫০ মিলিয়ন
আটকা পড়ে আছে এবং
বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো

সুতরাং প্রথম কথা বি
বিদ্যালয় থাকলেও তা
তৃতীয়ত থাকার মতো থা
ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে
হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বিদ্য
হারিয়ে ফেলে, তখন অভি
কানে ধরে তাদেরকে টে
খাঁচায় বন্দী করে রেখে ব

যেকোনো জাতির
দারিদ্র্যের চাইতে মৌলি
অনেক বেশি কার্যকর
একমাত্র মৌলিক মানব
জনগণ বাজারের সুযো
ব্যর্থ হয়। দক্ষিণ এশি
লোক মৌলিক মানব
এখানকার জনগণের এক
ন্যূনতম আয় থেকে
বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে
অনেক দেশ একবিংশ
যথার্থভাবে লিপ্ত হবে অ
পিছিয়ে পড়ি তা হলে এ
তিমিরে ছিলাম, সেই
আগামী দিনগুলোতে
বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এ
প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে
নিশ্চিতভাবে বলা যায়,
এমন একটা সময়ে যখন
যাচ্ছে এবং যখন তা
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ
সামর্থ্য আছে।

সুতরাং, সর্বজনীন
প্রযুক্তি ও সুশাসন আগা
উপাদান। এ দেশের
বিদ্যালয়ের বিদ্যা রপ্ত
হয়তোবা টিকে থাক
অনুসৃত সর্বজনীন প্র
আরো শক্তিশালী করা
উচিত বলে আমরা ম
মাধ্যমে প্রাথমিক
মানোন্নয়ন, বিদ্যাল
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ
যুগোপযোগীকরণের
বিদ্যালয়ের বিদ্যা নি
বিদ্যালয়ের শিক্ষাই
প্রথম।

আবদুল বায়েস :
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যা